একক ১ ভারতের দলব্যবস্থার বিবর্তন ও বিকাশ

গঠন

১.১ সূচনা

সূচনা

যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের এক অপরিহার্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক দলব্যবস্থা। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের দলব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিবর্তনের উৎসমুখ খুঁজে পাওয়া যাবে ভারতের বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যে। রজনী কোঠারি ও মরিস জোনসের মতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে আধিপত্যমূলক দলব্যবস্থা বা dominant party system-এর উদ্ভব হয়। এই সময় বহুদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল একচ্ছত্র ও অবিংসবাদিত। বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে এই একদলীয় প্রাধান্যকে সমালোচকগণ 'paradox of single dominant party system within multipartysm' আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের দলীয় ব্যবস্থার চরিত্র যথাযথভাবে অনুধাবন করবার জন্য সর্বাগ্রে তার বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক।

(ক) ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রক্রিয়া ঃ

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ভারতে একদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দলব্যবস্থার সহাবস্থান পরিলক্ষিত হলে এইসময় বিরোধী দলগুলির ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত কারণ সংসদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে তারা কোনরকম বাধা সৃষ্টি করতে অসমর্থ হয়েছিল এবং রাজ্যস্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটগঠন করে ক্ষমতা ভাগ করতেও তারা সক্ষম হয়নি। এই সময় অবশ্য এক অর্থে বিরোধী দলগুলির ভূমিকার একটা গঠনমূলক চরিত্র ছিল কারণ তারা কেবলমাত্র বাধাদানের জন্য কংগ্রেসের পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেনি।

গঠনতান্ত্রিক সমালোচনার মধ্যেই নিজেদের বিরোধিতাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। রজনী কোঠারির মতে এই সময় কংগ্রেস ি ল 'party of consensus' এবং বিরোধী দলগুলি ছিল 'parties of pressure.'

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের এক বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। ই প্রথম আটটি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং কেন্দ্রীয় স্তরে মোট আসনের মাত্র ৫৪% অর্জন করতে সমর্থ হয়। কোঠারির মতে "Congress dominance was diminished because its performance in the art of Government was subjected to harsh judgement by supporters and opposition alike." এই পর্যায়ে কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় খুবই প্রকট হয়ে ওঠে এবং সমালোচকেরা একে 'de-institutionalization of the Congress' বলে অভিহিত

করেছেন। এর অন্যতম কারণ ছিল প্রধানত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের দলীয় সংগঠন পরিচালনার নীতি। তিনি বহু ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করতেন এবং এই সময় ভারতীয় রাজনীতি স্পষ্টভাবেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক রূপ ধারণ করে। এর ফলে সর্বভারতীয়স্তরে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। এই পর্যায় থেকেই ভারতীয় রাজনীতির গুণগত রূপান্তর সূচিত হতে থাকে।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস কেন্দ্র থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং শ্রীমতী গান্ধি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনারায়ণের কাছে ৫৫,০০০ ভোটে পরাজিত হন। এই নির্বাচনের আগে থেকেই ভারতব্যাপী যে ইন্দিরাবিরোধী হাওয়া বইতে শুরু করেছিল তা ছিল তাঁর পরিবার পরিকল্পনাকে বলপূর্ব্বক কার্যকরী করার নীতি, তদুপরি জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস এবং সর্বোপরি লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ করে রাখার ফলশ্রুতি। শেষপর্যন্ত ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনতা দল কংগ্রেসের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং কংগ্রেসের একাধিপত্য বা hegemony চূর্ণ হয়ে যায়। এই নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু জনতাদলের নীতি বা মতাদর্শের জয়ের নির্দেশক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কংগ্রেস ঘোষিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে দেশের মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ। জনতাদলের মেয়াদ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই দল ছিল নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্বে আকীর্ণ এবং তার নেতৃত্বের ভিত্তি যেমন শক্তিশালী ছিল না। ১৯৮০ সালে জনতা সরকারের পতন ঘটে এবং ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়।

১৯৮০ সালের পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকান্ডের পর তার পুত্র রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার পিছনে যে প্রধান কারণ ছিল নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি। তাছাড়া এই সময় জাতীয় সংহতির সংকট বিশেষভাবে অনুভূত হয় বিশেষত পাঞ্জাবের রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসবাদ ও আসাম ও গোর্খাল্যান্ডের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। এক অর্থে ১৯৮৪ সালের নির্বাচন পূর্বের নির্বাচনগুলির থেকে পৃথক কারণ ইতিপূর্বে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল বিশেষ ঘটনা বা issue based election' ছিল না। সমালোচকের ভাষায় 'it was decided at the level of anxieties images and symbols.' আশির দশক থেকে ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভি িতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস তখনো কেন্দ্রীয় সংসদে তার প্রাধান্য বজায় রেখেছিল এবং বহু রাজ্য বিধানসভাতেও তার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত, কিন্তু সংসদের বাইরে তার আধিপত্য সংশয়াতীতভাবে খর্ব হয়েছিল।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক বিন্যাসের পর্যালোচনা করলে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে এইসময় আঞ্চলিক বহুদলীয় ব্যবস্থা (region-based multi-party system) ভারতে কায়েম হয়। নব্বইয়ের দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভারতীয় জনতা পার্টির (বি. জে. পি) অভ্যুদয়। ১৯৮৯ সালে লোকসভায় বি.জে.পি'র সর্বমোট আসন সংখ্যা ছিল ৮৬, কিন্তু ১৯৯৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৯।

ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গামঞ্চে বি.জে.পি'র আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল প্রকৃতপক্ষে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে বি.জে.পি নিজেকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সফল হয়েছিল। পরিসংখ্যান এইকথাই প্রমাণ করে যে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ এর মধ্যে বি.জে.পি'র জনসমর্থনের ভিত্তি সম্প্রসারিত হয় এবং ১৯৯১ সালে এই দল ও নতুন ভোটদাতাদের (১৮ থেকে ২১ বছর বয়সী) ২৭.৩% ভোট অর্জনে সক্ষম হয়।

পাশাপাশি কংগ্রেস সর্বভারতীয় স্তরে তার আধিপত্য হারাতে থাকে। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ এর মধ্যে তার জনসমর্থনের হার ৫০% থেকে কমে ৪০% এর নীচে নেমে যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই ক্ষমতায় আসে। এইসময় একের পর এক কেলেঙ্কারির সঙ্গে কংগ্রেসের নাম যুক্ত হয় যার ফলে জনসাধারণের চোখে তার ভাবমূর্তির অবনমন ঘটে।

১৯৯৬ সালে বি. জে. পি. যখন সর্বপ্রথম ক্ষমতায় আসে তখন যুক্তফ্রন্টের যোগদান না করেও কংগ্রেস বি.জে.পি-কে অপসারণের জন্য তাকে সমর্থন করে ফলে ১৩ দিনের মাথায় অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে গঠিত বি.জে.পি সরকারের পতন হয়। এরপর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নীতিগত বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে, ফলে ১৯৯৮ সালে দেবগৌড়া সরকারের পতন হয়। এই সময় বি.জে.পি দেবগৌড়া সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে ভোট দিয়েছিল যদিও কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সঙ্গে। সম্ভবত ১৩ দিনের মাথায় অপসারণের তিক্তস্মৃতি তার মনে জাগরুক ছিল।

১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে বি.জে.পি সংসদে সর্ববৃহৎ দল হিসাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সারে নির্বাচনে তার ভরাডুবি ঘটে এবং কংগ্রেস দীর্ঘকাল পরে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কংগ্রেসের এই প্রত্যাবর্তন কিন্তু তাঁর পূর্বের একাধিপত্যের পুনঃস্থাপনের পরিচায়ক নয় কারণ বর্তমান U.D.F সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি ফলে তার hegemonic status পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আঞ্চলিক দলগলির সমর্থনের উপর কংগ্রেস আজ অনেকাংশে নির্ভরশীল। নব্বইয়ের দশক থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রকট হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রিকরণ বা federalization ঘটেছে। অদীতি দে শর্মার মতে আমেরিকার মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের তুলনায় ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা পৃথক ও স্বতন্ত্র। কারণ সেখানে জাতীয় স্তরে কোন আঞ্চলিক দলের প্রভাব এত বৃহৎ নয়। ভারতে কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরের দলগুলির সমর্থনের কাঠামো অঞ্চলভিত্তিক। এই যুক্তরাষ্ট্রিকৃত বহুদলীয় ব্যবস্থা নতুন সহস্রাব্দে আরো জোরদার হবে। কারণ বর্তমানে আঞ্চলিক রাজনীতি বহুলাংশে জাতীয় রাজনীতির নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের ভূমিকার উপরেও সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৯৮৮ সালে জনমোর্চা, জনতা, ডি.এম.কে, তেলেগু দেশম, লোকদল (বি), কংগ্রেস (এস) ও অসম গণপরিষদকে নিয়ে ন্যাশনাল ফ্রন্টের গঠন হয়। এর মধ্যে বামফ্রন্টও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৮৯-৯০ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের

নেতৃত্বে কোনো ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় তবে ১৯৯১ সালে তার পতন ঘটে। ১৯৯৫-এর পর থেকে তেলেগু দেশম, জনতা দল ও বামফ্রন্ট তৃতীয়ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করে প্রধানত অকংগ্রেসী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির সমাবেশের মাধ্যমে। তবে আঞ্চলিক দলগুলির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে মতাদর্শগত বিরোধ তৃতীয় ফ্রন্টের বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত তার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় বি.জে.পি. বিরোধিতা।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর বি.জে.পি অপসারণের পিছনে জাতীয়ফ্রন্ট-বামফ্রন্টের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং ২০০৪ সালের নির্বাচনেও তা প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতির বিকল্প শক্তিরূপে তৃতীয় ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয় কারণ কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে বাইরে থেকে কেন্দ্রীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করাই এই ফ্রন্টের নীতিগত অবস্থান। অবশ্য রাজনৈতিক কারণে ইতিপূর্বে বি.জে.পি.'র সঙ্গে জাতীয় ফ্রন্টের ঐক্য ঘটেছিল রাজীব গান্ধি সরকার অপসারণের তাগিদে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতা ভবিষ্যতে তেমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করবে কিনা তা ভবিষ্যতেই প্রমাণিত হবে।

(খ) ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও মতাদর্শ ঃ

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে দেওয়া আবশ্যক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার প্রতিটি ইস্তেহারে ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সংখ্যালঘু শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ, ভূমিসংস্কার, সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতীয় ঐক্য, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, দারিদ্র অপসারণ প্রমুখ লক্ষ্যসাধনের প্রতি অবিচল আনুগত্য ব্যক্ত করেছে। ১৯৮৯ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছিল 'secularism is the bedrock of our nationhood, the core of our value system. Religion and politics must be separated' মতাদর্শগতভাবে কংগ্রেস সাম্যবাদের প্রতি তার আস্থা ব্যক্ত করেছে। উপরোক্ত ইস্তেহারে বলা হয়েছিল 'our socialism is neither dogmatic nor borrowed from abroad. It is an authentic Indian idelogy deriving from the experience of history and the realities of soceity' কংগ্রেসের সাম্যবাদী আদর্শের স্তম্ভ হল জনগণের ক্ষমতায়ন অর্থাৎ Peoples power। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোরদার করে তোলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রয়াসের কথা কংগ্রেসের প্রতিটি নির্বাচনী ইস্তেহারে ব্যক্ত হয়েছে।

বি.জে.পি তার ঊষালগ্ন থেকেই হিন্দুত্ববাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও আদর্শের সার্থক সমন্বয়ের দ্বারা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের কথা (cultural nationalism) বি.জে.পি ধারাবাহিকভাবে বলে এসেছে। বি.জে.পি ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার (Positive secularism) পৃষ্ঠপোষক। এই ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের ঐতিহাসিলক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। অচিন বিনায়ক তাঁর 'The Painful Transition' গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন 'The openly pro-Hindu idelogy of the B.J.P puts it outside the pale of left and secular front perspective. The Congress may have communal elements and may sometimes engage in communal politics but it is not fundamentally communal while the B.J.P. R. S. S. is.

বি.জে.পি নির্বাচনী ইস্তেহারগুলিতে যে উদ্দেশ্যগুলি অগ্রাধিকার পেয়েছে তা হল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়ের পথের বাধা অপসারণ এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৪ সালে গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে চীনের ভারত আক্রমণকে কেন্দ্র করে সি.পি.আই ও সি. পি. আই.এমেরে মধ্যে বিভাজন ঘটে। মতাদর্শগতভাবে উভয়েই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করেছে, তবে সি. পি. আই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নৈকট্য বজায় রেখেছিল পক্ষান্তরে সি. পি. এম সোভিয়েত ও প্রজাতন্ত্রী চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমদূরত্ব রক্ষা করেছিল। সত্তরের দশকে কংগ্রেসের সঙ্গে ,সি. পি. আই- ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি তবে আশির দশকে উভয় দলের ঐক্যের প্রশ্ন উঠেছিল যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সি. পি. আই অবশ্য বামফ্রন্টে অন্যতম শরিক। এছাড়াও রয়েছে রেভেলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আর এস পি) ও ফরওয়ার্ড ব্লক। সি. পি. এম ও সি. পি. আইন উভয়ের নির্বাচনী ইস্তেহারগুলি তুলনা করলে দেখা যাবে যে উভয় দলেই ভারি শিল্পের জাতীয়করণ, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, আয়বৈষম্যের অবসান, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাদের অবিচল আত্মনিয়োগ প্রকাশ করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে তাদের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান নেই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে এই দুই দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কোথায় ? এ বিষয়ে অচিন বিনায়কের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য— 'The basic historical features of Indian communism, have been functionalism split and convergence, but not re-unification.

(গ) ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের প্রভাব ঃ

আঞ্চলিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করে এস. এল. সিক্রি বলছেন 'Regional parties are those which generally and exclusively operate withinn limited area or which represent the interests of particular lingustic ethnic or cultrual groups.' সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির তুলনায় এই দলগুলির সামাজিক ভিত্তি অনেক সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে ও এ. আই. এ. ডি. এম কে, পাঞ্জাবের আকালি দল, জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স, আসামের অসম গণপরিষদ, অন্ধ প্রদেশের তেলেগু দেশম প্রমুখ আঞ্চলিক দলগুলির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণগুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কেবলমাত্র আঞ্চলিক দাবিদাওয়া চরিতার্থ করার মধ্যে এই দলগুলির ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা কেন্দ্রীয়স্তরে মন্ত্রসভা গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৯৬ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলি এক স্বতন্ত্র গুরুত্ব অর্জন করে এবং নব্বইয়ের বেশি লোকসভা আসন দখল করে যা জনতাদল ও সি. পি. এমের অর্জিত সর্বমোট আসন সংখ্যাকে অতিক্রম করে যায়। সাতটি রাজ্যে তারা এককভাবে অথবা অন্যান্য সমমতাবলম্বী দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতা অর্জন করে। অন্যান্য রাজ্যে তারা প্রধান বিরোধীদলের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা এবং আঞ্চলিক বাস্তব সম্পর্কে সর্বভারতীয় দলগুলির উদাসীনতা আঞ্চলিকতাবাদকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যসরকারের এলাকায় কেন্দ্রীয়

সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আঞ্চলিকতাবাদকে ইন্ধন জুগিয়েছে। অমিতাভ রায়ের মতে ষাটের দশকের দেশভাগ থেকে কংগ্রেসের অবক্ষয় আঞ্চলিক দলগুলির বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কংগ্রেস যতদিন আঞ্চলিক স্বার্থগুলিকে নিজের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে অধিগ্রহণ করতে সমর্থ ছিল, ততদিন আঞ্চলিকতাবাদের উন্মেষ ঘটেনি, কিন্তু সত্তরের দশকের শুরু থেকে কংগ্রেসের কেন্দ্রীকৃত নেতৃত্ব আঞ্চলিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। আসাম আন্দোলনের সময় বে-আইনি অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেসের নিস্পৃহতায় বিষয়টি বিশেষভাবে ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা আঞ্চলিকতাবাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। Paul Brass যথার্থই বলেছেন 'statistics reveal that the inequalities that had been there among the states in the pre-independence period, peristed even after it'. এইভাবেই বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি স্তরে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে অগ্রাধিকার পেয়েছে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী স্বার্থ। Paul Brass মন্তব্য করেছেন, 'there is virtual unanimity among scholars who have analyzed inter-regional resource transfers have not only been able to prevent the increasing gap between the rich and poor states, but may also have contributed to accentuating the disparties, আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন Robert Stern। তাঁর মতে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে প্রাদেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে বিশেষত কৃষক শ্রেণির মধ্যে। সবুজ বিপ্লব ও কৃষিক্ষেত্রের বাণিজ্যিকরণের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় অর্থনীতির উপর। প্রাদেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয়স্তরে বাজারের দখল নেওয়ার জন্য অনেকক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে।

মনস্তাত্ত্বিক কারণেও আঞ্চলিকতার প্রসার বিস্তার ঘটে। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আঞ্চলিক নেতারা যার সদ্ব্যবহার করে থাকেন। কোন বিশেষ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় জনগ্রসরতা আঞ্চলিক দলের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি আন্দোলন। কে পি পি বা কামতাপুর পিপলস পার্টির নেতৃত্বে এই আন্দোলন স্পষ্টতই রাষ্ট্রবিরোধী হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন। এই আঞ্চলিকতাবাদের পিছনে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কারণ যেমন ছিল, একই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল অত্যন্ত গভীর।

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের ভূমিকা বহুমাত্রিক। যেহেতু ভারতীয় রাজনীতির পালাবদলের সাথে সাথে জোট রাজনীতির বা Coalition Politics এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, সেই সূত্রে আঞ্চলিক দলের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ভর করে আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনের উপর। সর্বভারতীয় দলগুলিও এদিক দিয়ে স্বনির্ভর নয়। ভারতীয় রাজনীতির যুক্তরাষ্ট্রিকরণের যে প্রক্রিয়ার কথা সমালোচকরা বলে থাকেন, তাকে পরমুখাপেক্ষী রাজনীতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে সর্বভারতীয় দলগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে কিনা যে প্রশ্নটিও আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সামগ্রিক বিচারে আগমী দিনে আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে, বিশেষত জোট গঠনের ক্ষেত্রে, একথা মনে হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত।

(ঘ) ভারতীয় দলব্যবস্থা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় রাজনীতি ক্রমশঃ বহুদলীয় ব্যবস্থার এক নূতন রূপধারণ করতে চলেছে। ২০০৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল বি.জে.পি কি ভবিষ্যতে ক্ষমতায় ফিরতে পারবে ? বি.জে.পি'র সামনে এখন বিরাট মতাদর্শগত সংকট। আর এস এস (রাষ্ট্রিয় স্বয়ংসেবক সংঘ) ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ ক্রমাগত বি.জে.পি'র ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তাদের নির্দেশিত হিন্দুত্বের পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য যা স্পষ্টতই উগ্র হিন্দুত্বের পথ। বিজেপি'র কর্ণধার লালকৃষ্ণ আদবানি জানিয়েছেন যে বিজেপি অনুসৃত হিন্দুত্ববাদের নির্যাস হল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও অন্তর্নিহিত মানবতাবাদ। এখানেই আর. এস. এসের সঙ্গে বিজেপি'র মতাদর্শগত পার্থক্য। আদবানির কাছে হিন্দুত্ব হল জীবনযাপনের নীতি পক্ষান্তরে আর.এস.এসের কাছে তা হল রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতার দর্শন। বিজেপি'র নমনীয় হিন্দুত্ববাদের নীতি তার অন্য দুই শরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় বিজেপি আর এস এসের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে কিনা তা কৌতূহলের বিষয়।

বামফ্রন্টের ভূমিকা সাম্প্রতিককালে যেনতেন প্রকারে বি.জে.পিকে প্রতিরোধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসুকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়, কিন্তু দীর্ঘ বিতর্কের পরে সি.পি.এম পলিটব্যুরো এই প্রস্তাবকে নাকচ করে যা পরবর্তীকালে 'ঐতিহাসিক ভ্রান্তি' রূপে বিবেচিত হয়েছে। এর পরে বামফ্রন্ট সর্বভারতীয়স্তরে ক্ষমতা দখল করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বর্তমানে কিন্তু বামফ্রন্ট কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ব্যাপারেই অধিক আগ্রহী। ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী দল হিসাবেই বামফ্রন্ট নিজের অস্তিত্বকে তুলে ধরতে চাইছে। তৃতীয় ফ্রন্টের ধারণার বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই যদিও পরিবর্তনশীল রাজনীতিতে ভবিষ্যত কোন্ দিকে মোড় নেবে তা জল্পনার বিষয়। বামফ্রন্ট স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিজোট গড়ে তুলতে আগ্রহী এবং এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে তার মতাদর্শগত বিরোধ গৌণ হয়ে গিয়েছে। সামগ্রিক বিচারে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় রাজনীতিতে কোন দলই বিশেষ কোন মতাদর্শকে অনির্দিষ্টকাল আশ্রয় করে থাকতে পারে না এবং রাজনৈতিক কারণে মতাদর্শগত বিরোধকে তুচ্ছ করে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস (alignment and realignment of political forces) ঘটে। এখানে ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।

(ঙ) সারাংশ ঃ

ভারতের দলব্যবস্থা বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল বহুদলীয় ব্যবস্থা খাতায় কলমে বিদ্যমান থাকলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত। সাম্প্রাতিককালে নানা বিচিত্র ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে জোটরাজনীতি বা Coalition

Politics ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার সঙ্গে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার ও বিস্তার ঘটেছে। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের দলব্যবস্থআর চরিত্রগত পরিবর্তন কিভাবে ঘটেছে, তা উপরোক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) কোন বছরের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাধান্য খর্ব হয় ?

(খ) ভারতের কোন রাজনৈতিক দল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ?

(গ) ভারতের যে কোন তিনটি আঞ্চলিক দলের নাম উল্লেখ করুন।

২। নীচের প্রশ্নগুলির রচনাধর্মী উত্তর দিন ঃ

(ক) ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য কি ছিল ?

(খ) দলীয় ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীকরণ বলতে কি বোঝায় ?

(গ) বি.জে.পি'র হিন্দুত্ববাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ?

৩। ২৫০ শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিকতাবাদের উন্মেষ কিভাবে ঘটেছিল ?

(খ) ভারতীয় দলব্যবস্তায় বামপন্থী দলগুলির ভূমিকার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

(গ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতাদর্শ ও কর্মসূচি সক্ষেপে আলোচনা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ১.৪

ক। Ramesh thakur, The Government and politics of India, Macmillan Press limited, 1995.

খ। Rakhahari Chatterji, ed Politics India, The state soceity interface, South Asian Publishers, New Delhi, 2001.

একক ২ ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও জনগণের ক্ষমতা

গঠন

২১ সূচনা

২.২ ভারতের নির্বাচন কমিশন

২.৩ মূল্যায়ন

২.৪ অনুশীলনী

সূচনা

যে কোন গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত হল নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতি অনেকাংশে নির্বাচন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল থাকে কারণ জনগণের ভোটের দ্বারাই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং যে কোন রাজনৈতিক দলের শাসনের বৈধতা জনসমর্থনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত হল নির্বাচন ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নির্বাচন যদি পরিচালিত না হয় সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এসে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাখহরি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'If the representatives fail to keen their promise, or do things that are morally questionable, if not outright immoral, or engage in activities which are manifestly subversive of any commonsense notion of public interest, then fife years must be considered too long a term to bear with them.' এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে নির্বাচন চলাকালীন যদি অসাধু ও অসৎ পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহলে নির্বাচনের পরবর্তীকালে তার সম্প্রসারিত রূপ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সুতরাং নির্বাচনের বৈধতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক এবং এখানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রাতিককালে ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিদগ্ধমহলে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং কমিশনের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পুনর্মূল্যায়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বিপুলভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এধরনের নতুন চিন্তাভাবনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, কারণ সাম্প্রতিককালে ভারতীয় রাজনীতি নানাবিধ কলুষের দ্বারা সমীলিপ্ত হয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রকাশ রাজনৈতিক জীবনের নানাস্তরে ঘটে চলেছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'In Indian politics today, the greatest challenge comes from the unholy nexus between politics business and the under world. The money-mafia axis is unscrupulously used by the politicians in their quest for political power.' স্বাধীনতার আগে মহাত্মা গান্ধী নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত রাখার

ব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে নির্বাচন প্রার্থীদের নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ মানুষ হতে হবে এবং তাঁদের পদের মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে। গান্ধী এমনকি নির্বাচনী তদ্বির ও প্রচারেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ছিল স্পষ্টতই আদর্শবাদী। বর্তমানে ভারতবর্ষে গান্ধির প্রত্যাশা যে পূরণ হয়নি তা বলাই বাহুল্য তবে নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়টি গভীরভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। কোন কাল্পনিক ধারণা বা Utopia-কে গ্রহণ না করে বাস্তবানুগ প্রণালীতে নির্বাচনী ব্যবস্থার পরিশোধন অবশ্যই সম্ভব।

ভারতের নির্বাচন কমিশন

সংবিধানের ৩২৪(২) ধারা অনুসারে 'The Election Commission shall consist of a Chief Election Commissioner and such other commissioners as the president may from time to time, fix.' প্রথমে মুখ্যনির্বাচনী অধিকর্তা ছাড়া আর কোন কমিশনারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৬-১০-৮৯ রাজীব গান্ধি সরকার দুজন কমিশনারকে নিয়োগ করে কমিশনকে multimember commission-এ রূপান্তরিত করে। এর পর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের জাতীয় ফ্রন্ট সরকার কমিশনকে তার পুরানো রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু ভারতের নরসিমা রাও সরকার পুনরায় এম এস গিল ও জি. কৃষ্ণমূর্তিকে কমিশনাররূপে নিয়োগ করে।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত এই কমিশন বা ভোটার তালিকা বা electoral roll তৈরি করে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষ া ও জনসাধারণকে সে সম্পর্কে অবহিত করা কমিশনের অন্যতম কাজ। যদি কোথাও নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ হয়েছে বলে কমিশন সন্দেহ করে তাহলে সেখানে কমিশন পুনরায় ভোটগ্রহণের ডাক দিতে পারে। আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচনী অধিকর্তা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক দলগুলির জন্য আচরণবিধি তৈরি করা। এছাড়া প্রার্থীর নির্বাচনী অর্থব্যয়ের হিসাব কমিশনের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ বা সমস্যার কথা মুখ্য নির্বাচন অধিকর্তাকে জানাতে পারেন এবং কোন প্রার্থীর যোগ্যতা যদি সংশয়ের উর্ধ্বে না থাকে তা হলে তাকে লোকসভা বা বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন অধিকর্তা রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনের দ্বারা স্বীকৃত হয় এবং তাদের নির্বাচনী প্রতীক চিহ্নগুলি কমিশনের দ্বারাই বিতরিত হয়।

নির্বাচন কমিশন যে আদর্শ আচরণবিধি বা Model Code of Conduct তৈরি করেছে তার প্রধান শর্তগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমত, কোন রাজনৈতিক দল কোন বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার মারতে বা slogan লিখতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক প্রচারের জন্য কোন সরকারি বাড়ি ব্যবহার করা যাবে

না। নির্বাচনের দায়িত্বে যে Officer-দের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের নির্বাচন শেষ হওয়ার আগে স্থানান্তরিত করা যাবে না। কোন মন্ত্রীকে নির্বাচনী বুথে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না যদি না তিনি নিজে প্রার্থী বা অন্য কোন প্রার্থীর agent হন। এছাড়া নির্বাচনী মিছিল বার করতে হলে পুলিশকে তার সময়সীমা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং যানজট সমস্যা যাতে না দেখা দেয় সে বিষয়ে যথাবিহিত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ১-৪-৯৬ সুপ্রীমকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা প্রদান করে যাতে করে অর্থের অপব্যবহার না হয়। এই রায় অনুসারে ৭-৪-৯৬ নির্বাচন কমিশন Chief Electoral Officer, রাজস্ব সচিব ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাজে নির্দেশনামা পাঠায় যার প্রধান অংশগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের হিসাব দাখিল করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদের Bank Balance সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বিবৃতি পেশ করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক প্রার্থীর অর্থব্যয়ের বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ সমীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হবে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা Chief Election Commissioner নির্বাচন কমিশনের শীর্ষে অবস্থান করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে নরসিমা রাও সরকার দুজন কমিশনারকে নিয়োগ করার পর মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিক কি তাঁদের সমান ক্ষমতা ভোগ করেন নাকি তাঁদের তুলনায় তাঁর পদমর্যাদা অধিক ? ভারতের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক টি. এন. শেষণ নরসিমা সরকারের উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সকে সুপ্রীম কোর্টে challenge করেন। কোর্ট তার রায়ে বলে যে নির্বাচন আধিকারিককে অন্য দুজন কমিশনারের সমপর্যায়ভুক্ত করা। ইতিপূর্বে কিন্তু S. S. Dhawan vs Union of India and others মামলায় সুপ্রীম কোর্ট তার রায় দিয়ে বলেছিল "The Election Commissioners cannot be equated with the Chief Election Commissioner and that the latter is not the first among equals but above the former in view of the constitutional scheme of Article 324 of the Constitution.

টি এন শেষণের বিভিন্ন কার্যকলাপ মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিকের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি করে। শেষণ ছিলেন নানা দিক দিয়ে এক ব্যতিক্রমী আধিকারিক যিনি নির্বাচনী সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পরিশোধন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এরই সঙ্গে তাঁর কর্মপদ্ধতি অনেকেরই তীব্র সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৯১ সালে শেষ নির্বাচনকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে পিছিয়েছেন যখন সমগ্র দেশ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ছিল। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি (কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত) সম্পর্কে তাঁর দাবি না মেটা পর্যন্ত সমস্ত উপনির্বাচন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে শেষণ এক আদেশ জারি করে মন্ত্রী রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও তাঁদের agent-দের ভোটের দিন গাড়ি ব্যবহারকে সঙ্কুচিত করেন। তিনি আরো বলেন যে যতদিন না ভোটারদের মধ্যে photo identity card বিতরণ করা হচ্ছে ততদিন নির্বাচন হবে না। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষণ ১৯৬৮ সালের Election Symbols Order-কে সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনের হাতে কোন রাজনৈতিক দল বিধিভঙ্গ করলে তাকে স্বীকৃতি প্রদান না করার অধিকার আরোপ

করতে উদ্যোগী হন। মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের বিরুদ্ধে শেষণ নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ আনেন এবং মে মাসে উত্তরপ্রদেশে উপনির্বাচন স্থগিত রাখেন কারণ মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব সরকারি হেলিকপ্টার নির্বাচনী প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি যে রাজনৈতিক দলগুলির বিরাগভাজন হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তারা অভিযোগ করে যে নির্বাচন কমিশন নিজেকে 'Super Government'-এ পরিণত করতে চাইছে। শেষণ তাঁর সাংবিধানিক অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করছেন এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করছেন, এমন অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে সুপ্রীম কোর্ট শেষণকে ভর্ৎসনা করে এবং নির্দেশ দেয় যে কোন রাজ্যসরকার যদি নির্বাচন চলাকালীন নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে তাহলে সেক্ষেত্রে শেষণ যেন সুপ্রীম কোর্টের মতামত অনুসারে কাজ করেন। এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার তাঁর নেই। এ প্রসঙ্গে অবশ্য কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। প্রথম শেষণ জনমানসে রেখাপাত করতে স ম হয়েছিলেন এবং একসময় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল ও বিরাট। এর কারণ সহজে অনুমেয়। ভারতের আপামর জনসাধারণ শেষণকে দেখেছিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীকরূপে। ইতিপূর্বে নির্বাচনে নানাবিধ অসাধুতা ও অনৈতিকতা তাদের ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এর ফলে ক্ষেত্র বিশেষে শেষণের অতিসক্রিয়তা কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্ত হলেও জনসাধারণের মধ্যে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি কারণ রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করার যে প্রয়াসে শেষণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাকে সাধারণভাবে ভারতের মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল। দ্বিতীয়ত একথা অনস্বীকার্য যে শেষণ মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিকের পদকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছিলেন যা ছিল নজিরবিহীন। শেষণের কর্মপদ্ধতি ছিল অবশ্যই একনায়কতান্ত্রিক, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং আজও নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণের অবকাশ আছে।

(খ) ভারতে নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ঃ

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রসঙ্গটি বহুলালোচিত। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সাধারণ নির্বাচনের শেষে তার নির্বাচনী প্রতিবেদনের মাধ্যমে নির্বাচনী আইন ও পদ্ধতি সংশোধনের প্রস্তাব আনতো। ১৯৭০ সালের আগে কিন্তু নির্বাচনী আইনের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয়নি।

১৯৭০ সালে নির্বাচন কমিশন এ সম্পর্কে একটি বিলের খসড়া করে এবং সংসদের জয়েন্ট কমিটি বিলে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি আইনকে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৭৩ সালে লোকসভায় বিল পেশ করে। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে সংসদ ভেঙে যাওয়ায় বিলটি কার্যকরী হয়নি তবে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত বিলের জয়েন্ট কমিটির অনুমোদিত নির্বাচন কমিশনের আনেকগুলি প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়েছিল। এরপর ১৯৭৭ সালে নির্বাচন কমিশনের সমস্ত প্রস্তাবগুলির পর্যালোচনা হয় এবং তার কিছু নতুন প্রস্তাব সংযোজনের মাধ্যমে ২২-১০-৭৭ কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্বাচনী সংস্কারের বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠানো হয়। আশির দশক থেকেই এই প্রস্তাবগুলি পর্যালোচিত ও বিশ্লেষিত

হয়ে এসেছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ।

প্রথমত, ভোটাধিকারের বয়সকে ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলির নথিকরণ বা registration বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া বুথ দখলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বাতিল করে দেবার অধিকার নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। পরন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যমেয়াদ ও শর্তাবলী সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির সমতুল্য বলে ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয়ের নির্দিষ্ট সীমাও বাড়ানো হয়েছে।

প্রথমত, ভোটাধিকারের বয়সকে ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলির নথিকরণ বা registration বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া বুথ দখলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বাতিল করে দোবর অধিকার নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যমেয়াদ ও শর্তাবলী সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির সমতুল্য বলে ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয়ের নির্দিষ্ট সীমাও বাড়ানো হয়েছে।

১৯৯০ সালে দীনেশ গোস্বামী কমিটি নির্বাচনী সংস্কার সম্পর্কিত যে প্রতিবেদন পেশ করে তার কয়েকটি প্রস্তাব পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়েছে। নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছে। প্রথমত, স্বাধীন ও স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয়ত নির্বাচন কমিশন যেন কোনভাবেই আইন বিভাগের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে টি এন শেষণের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। শেষণ নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত এবং নির্বাচন কমিশনের স্বাতন্ত্র্যকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে জনমানসে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলেও সরকারের সঙ্গে তাঁর যে তীব্র সংঘাত বাধে, তা কিন্তু স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ রাজনীতির নজির স্থাপন করেনি। একই সঙ্গে শেষণের প্রস্তাবগুলির প্রয়োজনীয়তা কিন্তু অনস্বীকার্য। তাঁর 'The Regeneration of India', গ্রন্থে শেষণ বলেছেন যে প্রত্যেক প্রার্থীকে তাঁর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দাখিল করতেই হবে। ভারতের নির্বাচনী ব্যবসথার নৈতিক অবনমনের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন 'The entire system of elections these days, has been reduced to hte application fo illegal power which is based on cash, corruption and criminalty or muscle power and ministerial power and abuse of office.' অসাধুতা ও অপকীর্তির দায়ে প্রার্থীদের অভিযুক্ত করার জন্য শেষণ Special Election Court-এর সুপারিশ করেছেন। তিনি একবার বলেছেন যে দোষী সাব্যস্ত হলে কোন প্রার্থীকে ভবিষ্যতে নির্বাচনে প্রতিদ্বি করার অধিকার না দেওয়া উচিত। এছাড়া যদি কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আদালতে উত্থাপিত হয়ে থাকে, তাহলে যেন কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনে দাঁড়তে না পারেন। প্রস্তাবগুলির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই তবে যদিও সংবিধান পর্যালোচনার জন্য গঠিত জাতীয় কমিটি নির্বাচনী সংস্কারের কথা উ খিত করেছে। এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত পথনির্দেশ তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। নতুন সহস্রাব্দের ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত কিন্তু বহুলাংশে নির্ভর করবে নির্বাচনী সংস্কারের সার্থকতার উপর। প্রতিষ্ঠানের স্তরে বিচ্ছিন্ন কিছু সংস্কার গণতন্ত্রকে বিশ্বাসযোগ্যতাকে দিতে অপারগ। তাছাড়া অশোক মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে কেবলমাত্র নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। একথা সত্য যে সাধারণ মানুষের নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহ

নির্বাচন কমিশনের মত প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্রের যাথার্থ্যকে প্রমাণ করে কিন্তু মানুষ যদি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয় তাহলে কিন্তু কোন ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে না। এখানেই সভ্যসমাজ বা Civil Soceity-র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে প্রতীয়মান হয়।

মূল্যায়ন

(গ) জনগণের ক্ষমতা—স্বপ্ন ও বাস্তব ঃ

জনগণের সার্বভৌমিকতা হল গণতন্ত্রের প্রধান স্মারকচিহ্ন। জনগণ যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সম্যকভাবে সচেতন না হয় তাহলে রাষ্ট্রীয়স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। এ বিষয়ে অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'In the final analysis, democracy demands for its success, a high ethical preparation of the people.' সাধারণ মানুষ নির্বাচনী সংস্কারের প্রত্যক্ষভাবে কতটা সামিল হতে পারেন, তা নির্ভর করে তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার ওপর। এ বিষয়ে রাখহরি চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন 'The argument that the ordinary citizens are ill-equipped for political activities compared to professional politicians need not deter us. It is imperative that ways of direct participation of the public in decision making must be devised.' সাম্প্রতিককালে ভারতে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের সময় জনমানসে ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং নানাবিধ জোরজবরদস্তির দ্বারা সাধারণ মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আচরণ করতে বাধ্য করে ফলে নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে না। এর ফলে গণতন্ত্র তার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হারিয়ে ফেলে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে সাধারণ সভ্য সমাজ বা Civil Soceity নির্বাচনী সংস্কারের ব্যাপারে কতটা অগ্রণী হয়েছে সংক্ষেপে তার ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। 90'র দশকে কর্ণাটকে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে নির্বাচনী সমীক্ষকের দল তৈরি হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তা ছিল সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিমন্ডল সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ০২-০৫-০২ সুপ্রিম কোর্টে এক যুগান্তকারী রায় দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে মনোনয়ন পত্র দাখিলের আগে মুচলেকা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয় যার দ্বারা তাঁদের সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কেও বিবৃতি দিতে হবে। ২১টি রাজনৈতিক দল ৮-৭-০২ একত্রিত হয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের বিরোধিতা করে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংক্রান্ত মুচলেকার বিষয়টি সুকৌশলে বাদ দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই যাঁরা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা জনগণের ক্ষমতায়নের বিরোধী ছিলেন। এইসময় কিন্তু সাধারণ মানুষের উদ্যোগ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা এক ভারতব্যাপী নির্বাচনী সংস্কার আন্দোলনের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। গুজরাটে Election Watch Committee গড়ে ওঠে যার প্রধান কাজ ছিল ভোটদাতাদের নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের সমপের্ক প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করা। জনগণের সরকারি কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাকার অধিকার বা Right to Information-কে প্রকারান্তরে বাস্তবায়িত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। দিল্লী ও রাজস্থানেও অনুরূপভাবে Election Watch গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাধারণ সমাজ ও

বেসরকারি সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, দিল্লী, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও তামিলনাড়ুতে Election Watch গড়ে ওঠে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে এবং ভোটার তালিকাকে যাচাই করে বহু কারচুপিকে উন্মোচিত করেছে।

সভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠানের (Civil Society Organization বা C.S.O) উদ্যোগের দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ২০০৪ সালের নির্বাচনে ভারতের ২০টি রাজ্য election watch-এর আয়োজন করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মহারাষ্ট্রের AGNI, অন্ধ্রপ্রদেশের লোকসভা, রাজস্থানের মজদুর ও কিষাণশক্তি সংগঠন, মধ্যপ্রদেশের সাধন, বাঙ্গালোরের জনগ্রহ ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণ সমাজ বা Civil society'-র অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ. বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশে লোকসভা নিরন্তর চাপসৃষ্টি করে রাজনৈতিক দলগুলিকে অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত প্রার্থীদের মনোনয়ন না দিতে বাধ্য করে। অ প্রদেশে এই ধরনের ৫১ জন প্রার্থীকে চিহ্নিত করা হয়। রাজস্থানের মজদুর ও কিষাণ শক্তি সংগঠন ট্রাকযাত্রার মাধ্যমে নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালায়। মুম্বাইয়ে AGNI'র ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

(ঘ) নির্বাচনী সংস্কার কোন পথে ?

ভারতে নির্বাচনী সংস্কার কেবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও আইনগত প্রণালীর ওপর নির্ভর করতে ক্রমশ জনমুখী হচ্ছে যা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বিনা নির্বাচনী সংস্কার অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। Justice Venkatchaliah বলেছেন 'Civil society as a pillar of democracy, should work on collaboration with bureaucarcy, parliament, judiciary and media.' অবশ্য একথাও সত্য যে C.S.O গুলির পক্ষে এককভাবে কাজ করা সহজ নয় এবং গণমাধ্যম, সুপ্রীম কোর্ট প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতা তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সাম্প্রতিককালে বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তা বা Civil society activism-এর যে উন্মেষ ভারতীয় রাজনীতিতে ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং এই নতুন ধারার সম্প্রসারণ বিতর্কের সৃষ্টি করতে বাধ্য। তথাপি এছাড়া গণতন্ত্র সংরক্ষণের কোন বিকল্প পথ নেই। নির্বাচন কমিশনকেও এখানে সর্বতোভাবে সাধারণ সমাজের পাশে দাঁড়াতে হবে। নির্বাচনী সংস্কার যদিও যৌথ উদ্যোগের ফলশ্রুতি, তবু মুখ্য দায়িত্ব সাধারণ মানুষকেই নিতে হবে কারণ মানুষ হল গণতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতের কোন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার নির্বাচনী সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ?

(খ) ভারতের সংবিধানের কোন ধারায় নির্বাচন কমিশনের গঠনের উল্লেখ আছে।

(গ) দীনেশ গোস্বামী কমিটি কোন সালে তার প্রতিবেদন পেশ করে ?

২। **নীচের প্রশ্নগুলির রচনাধর্মী উত্তর দিন ঃ**

(ক) টি এন শেষণ কী ধরনের নির্বাচনী সংস্কারের ওপর গুরত্ব আরোপ করেছিলেন ?

(খ) নির্বাচন কমিশন প্রবর্তিত আদর্শ আচরণ বিধি বলতে কি বোঝায় ?

(গ) মুখ্যনির্বাচন কমিশনারের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। **২৫০ শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ**

(ক) ভারতে নির্বাচনী সংস্কার কতখানি কার্যকরী হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

(খ) নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(গ) নির্বাচনী সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কী জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়েছে।

৪। **গ্রন্থপঞ্জি ঃ**

(ক) T. N. Seshan, The Regeneration of Idnai, Vikign 1995

(খ) 1995 West Bengal Political Science Association souvenir.

Ashok K. Mukhopadhyay, Eletoral Press and Indian Politics

Rakhahari Chatterji, Electgoral Politics—Saving also people from their representatives.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

৫। সারাংশ ঃ

ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ। দীর্ঘকাল ধরে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। তবে সংগঠিতভাবে এই উদ্যোগকে গণআন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করা যায়নি। নির্বাচন ব্যবস্থার শুদ্ধিকরণের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের বিজয়কে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রকে কতখানি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে, উক্ত প্রবন্ধে তা আলোচিত হয়েছে।